জন্মদিনে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়

২ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট। কলিকাতা

প্রকাশ : ১ বৈশাখ ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ : মাঘ ১৩৪৯, আষাঢ় ১৩৫১, শ্রাবণ ১৩৫৩
২৫ বৈশাখ ১৩৫৯, ২৫ বৈশাখ ১৩৬২, ভাদ্র ১৩৬৪
২৫ বৈশাখ ১৩৬৭ : ১৮৮২ শক

পৃষ্ঠাঙ্ক

পৃষ্ঠাঙ্ক

জন্মদিনে

১

সেদিন আমার জন্মদিন।
প্রভাতের প্রণাম লইয়া
উদয়দিগন্ত-পানে মেলিলাম আঁখি,
দেখিলাম সদ্যস্নাত উষা
আঁকি দিল আলোকচন্দনলেখা
হিমাদ্রির হিমশুভ্র পেলব ললাটে।
যে মহাদূরত্ব আছে নিখিল বিশ্বের মর্মস্থানে
তারি আজ দেখিনু প্রতিমা
গিরীন্দ্রের সিংহাসন-'পরে।
পরম গাম্ভীর্যে যুগে যুগে
ছায়াঘন অজানারে করিছে পালন
পথহীন মহারণ্য-মাঝে,
অভ্রভেদী সুদূরকে রেখেছে বেষ্টিয়া
দুর্ভেদ্য দুর্গমতলে
উদয়-অস্তের চক্রপথে।
আজি এই জন্মদিনে
দূরত্বের অনুভব অন্তরে নিবিড় হয়ে এল।

যেমন সুদূর ঐ নক্ষত্রের পথ
নীহারিকাজ্যোতির্বাষ্প-মাঝে
রহস্যে আবৃত,
আমার দূরত্ব আমি দেখিলাম তেমনি দুর্গমে—
অলক্ষ্য পথের যাত্রী, অজানা তাহার পরিণাম।
আজি এই জন্মদিনে
দূরের পথিক সেই তাহারি শুনিনু পদক্ষেপ
নির্জন সমুদ্রতীর হতে ॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
সকাল

২

বহু জন্মদিনে গাঁথা আমার জীবনে
দেখিলাম আপনারে বিচিত্র রূপের সমাবেশে।
একদা নূতন বর্ষ অতলান্ত সমুদ্রের বুকে
মোরে এনেছিল বহি
তরঙ্গের বিপুল প্রলাপে
দিক হতে যেথা দিগন্তরে
শূন্য নীলিমার 'পরে শূন্য নীলিমায়
তটকে করিছে অস্বীকার।
সেদিন দেখিনু ছবি অবিচিত্র ধরণীর—
সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে
জলমগ্ন ভবিষ্যৎ যবে
প্রতিদিন সূর্যোদয়-পানে
আপনার খুঁজিছে সন্ধান।
প্রাণের রহস্য-ঢাকা
তরঙ্গের যবনিকা-'পরে
চেয়ে চেয়ে ভাবিলাম,
এখনো হয় নি খোলা আমার জীবন-আবরণ—
সম্পূর্ণ যে আমি
রয়েছে গোপনে অগোচর।
নব নব জন্মদিনে
যে রেখা পড়িছে আঁকা শিল্পীর তূলির টানে টানে

ফোটে নি তাহার মাঝে ছবির চরম পরিচয়
শুধু করি অনুভব,
চারি দিকে অব্যক্তের বিরাট প্লাবন
বেষ্টন করিয়া আছে দিবসরাত্রিরে ॥

উদয়ন । শান্তিনিকেতন
২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
বিকাল

৩

জন্মবাসরের ঘটে
নানা তীর্থে পুণ্যতীর্থবারি
করিয়াছি আহরণ, এ কথা রহিল মোর মনে।
একদা গিয়েছি চিন দেশে,
অচেনা যাহারা
ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 'তুমি আমাদের চেনা' ব'লে।
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছদ্মবেশ ;
দেখা দিয়েছিল তাই অন্তরের নিত্য যে মানুষ ;
অভাবিত পরিচয়ে
আনন্দের বাঁধ দিল খুলে।
ধরিনু চিনের নাম, পরিনু চিনের বেশবাস।
এ কথা বুঝিনু মনে,
যেখানেই বন্ধু পাই সেখানেই নবজন্ম ঘটে।
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা।
বিদেশী ফুলের বনে অজানা কুসুম ফুটে থাকে—
বিদেশী তাহার নাম, বিদেশে তাহার জন্মভূমি,
আত্মার আনন্দক্ষেত্রে তার আত্মীয়তা
অবারিত পায় অভ্যর্থনা॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
সকাল

৪

আরবার ফিরে এল উৎসবের দিন।
বসন্তের অজস্র সম্মান
ভরি দিল তরুশাখা কবির প্রাঙ্গণে
নব জন্মদিনের ডালিতে।
রুদ্ধ কক্ষে দূরে আছি আমি—
এ বৎসরে বৃথা হল পলাশবনের নিমন্ত্রণ।
মনে করি, গান গাই বসন্তবাহারে।
আসন্ন বিরহস্বপ্ন ঘনাইয়া নেমে আসে মনে।
জানি, জন্মদিন
এক অবিচিত্র দিনে ঠেকিবে এখনি,
মিলে যাবে অচিহ্নিত কালের পর্যায়ে।
পুষ্পবীথিকার ছায়া এ বিষাদে করে না করুণ,
বাজে না স্মৃতির ব্যথা অরণ্যের মর্মরে গুঞ্জনে।
নির্মম আনন্দ এই উৎসবের বাজাইবে বাঁশি
বিচ্ছেদের বেদনারে পথপার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
দুপুর

৫

জীবনের আশি বর্ষে প্রবেশিনু যবে
এ বিস্ময় মনে আজ জাগে—
লক্ষকোটি নক্ষত্রের
অগ্নিনির্ঝরের যেথা নিঃশব্দ জ্যোতির বন্যাধারা
ছুটেছে অচিন্ত্য বেগে নিরুদ্দেশ শূন্যতা প্লাবিয়া
দিকে দিকে,
তমোঘন অন্তহীন সেই আকাশের বক্ষস্তলে
অকস্মাৎ করেছি উত্থান
অসীম সৃষ্টির যজ্ঞে মুহূর্তের স্ফুলিঙ্গের মতো
ধারাবাহী শতাব্দীর ইতিহাসে।
এসেছি সে পৃথিবীতে যেথা কল্প কল্প ধরি
প্রাণপঙ্ক সমুদ্রের গর্ভ হতে উঠি
জড়ের বিরাট অঙ্কতলে
উদ্‌ঘাটিল আপনার নিগূঢ় আশ্চর্য পরিচয়
শাখায়িত রূপে রূপান্তরে।
অসম্পূর্ণ অস্তিত্বের মোহাবিষ্ট প্রদোষের ছায়া
আচ্ছন্ন করিয়া ছিল পশুলোক দীর্ঘ যুগ ধরি
কাহার একাগ্র প্রতীক্ষায়;
অসংখ্য দিবসরাত্রি-অবসানে
মন্থরগমনে এল
মানুষ প্রাণের রঙ্গভূমে;

নূতন নূতন দীপ একে একে উঠিতেছে জ্বলে,
নূতন নূতন অর্থ লভিতেছে বাণী ;
অপূর্ব আলোকে
মানুষ দেখিছে তার অপরূপ ভবিষ্যের রূপ,
পৃথিবীর নাট্যমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা-
আমি সে নাট্যের পাত্রদলে
পরিয়াছি সাজ।
আমারো আহ্বান ছিল যবনিকা সরাবার কাজে,
এ আমার পরম বিস্ময়।
সাবিত্রী পৃথিবী এই, আত্মার এ মর্তনিকেতন,
আপনার চতুর্দিকে আকাশে আলোকে সমীরণে
ভূমিতলে সমুদ্রে পর্বতে
কী গূঢ় সংকল্প বহি করিতেছে সূর্যপ্রদক্ষিণ—
সে রহস্যসূত্রে গাঁথা এসেছিনু আশি বর্ষ আগে,
চলে যাব কয় বর্ষ পরে॥

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

৬

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।
এ ধরায় জন্ম নিয়ে যে মহামানব
সব মানবের জন্ম সার্থক করেছে একদিন,
মানুষের জন্মক্ষণ হতে
নারায়ণী এ ধরণী
যাঁর আবির্ভাব লাগি অপেক্ষা করেছে বহু যুগ,
যাঁহাতে প্রত্যক্ষ হল ধরায় সৃষ্টির অভিপ্রায়,
শুভক্ষণে পুণ্যমন্ত্রে
তাঁহারে স্মরণ করি জানিলাম মনে—
প্রবেশি মানবলোকে আশি বর্ষ আগে
এই মহাপুরুষের পুণ্যভাগী হয়েছি আমিও॥

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

৭

অপরাহ্নে এসেছিল জন্মবাসরের আমন্ত্রণে
পাহাড়িয়া যত।
একে একে দিল মোরে পুষ্পের মঞ্জরি
নমস্কার-সহ।
ধরণী লভিয়াছিল কোন্ ক্ষণে
প্রস্তর-আসনে বসি
বহু যুগ বহ্নিতপ্ত তপস্যার পরে এই বর—
এ পুষ্পের দান
মানুষের জন্মদিনে উৎসর্গ করিবে আশা করি।
সেই বর, মানুষেরে সুন্দরের সেই নমস্কার
আজি এল মোর হাতে
আমার জন্মের এই সার্থক স্মরণ।
নক্ষত্রে-খচিত মহাকাশে
কোথাও কি জ্যোতিঃসম্পদের মাঝে
কখনো দিয়েছে দেখা এ দুর্লভ আশ্চর্য সম্মান।

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

৮

আজি জন্মবাসরের বক্ষ ভেদ করি
প্রিয়মৃত্যুবিচ্ছেদের এসেছে সংবাদ ;
আপন আগুনে শোক দগ্ধ করি দিল আপনারে,
উঠিল প্রদীপ্ত হয়ে।
সায়াহ্নবেলার ভালে অস্তসূর্য দেয় পরাইয়া
রক্তোজ্জ্বল মহিমার টিকা,
স্বর্ণময়ী করে দেয় আসন্ন রাত্রির মুখশ্রীরে,
তেমনি জ্বলন্ত শিখা মৃত্যু পরাইল মোরে
জীবনের পশ্চিমসীমায়।

আলোকে তাহার দেখা দিল
অখণ্ড জীবন, যাহে জন্মমৃত্যু এক হয়ে আছে।
সে মহিমা উদ্‌বারিল যাহার উজ্জ্বল অমরতা
কৃপণ ভাগ্যের দৈন্যে দিনে দিনে রেখেছিল ঢেকে॥

মংপু
বৈশাখ ১৩৪৭

৯

মোর চেতনায়
আদিসমুদ্রের ভাষা ওঙ্কারিয়া যায় ;
অর্থ তার নাহি জানি,
আমি সেই বাণী ।
শুধু ছলছল কলকল ;
শুধু সুর, শুধু নৃত্য, বেদনার কলকোলাহল ;
শুধু এ সাঁতার—
কখনো এ পারে চলা, কখনো ও পার,
কখনো বা অদৃশ্য গভীরে,
কভু বিচিত্রের তীরে তীরে ।
ছন্দের তরঙ্গদোলে
কত যে ইঙ্গিত ভঙ্গী জেগে ওঠে, ভেসে যায় চলে ।
স্তব্ধ মৌনী অচলের বহিয়া ইশারা
নিরন্তর স্রোতোধারা
অজানা সম্মুখে ধায়, কোথা তার শেষ
কে জানে উদ্দেশ ।
আলোছায়া ক্ষণে ক্ষণে দিয়ে যায়
ফিরে ফিরে স্পর্শের পর্যায় ।
কভু দূরে কখনো নিকটে
প্রবাহের পটে

মহাকাল দুই রূপ ধরে

পরে পরে

কালো আর সাদা।

কেবলি দক্ষিণে বামে প্রকাশ ও প্রকাশের বাধা

অধরার প্রতিবিম্ব গতিভঙ্গে যায় এঁকে এঁকে,

গতিভঙ্গে যায় ঢেকে ঢেকে ॥

১০

বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।
দেশে দেশে কত-না নগর রাজধানী—
মানুষের কত কীর্তি, কত নদী গিরি সিন্ধু মরু,
কত-না অজানা জীব, কত-না অপরিচিত তরু
রয়ে গেল অগোচরে। বিশাল বিশ্বের আয়োজন ;
মন মোর জুড়ে থাকে অতি ক্ষুদ্র তারি এক কোণ।
সেই ক্ষোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে
অক্ষয় উৎসাহে—
যেথা পাই চিত্রময়ী বর্ণনার বাণী
কুড়াইয়া আনি।
জ্ঞানের দীনতা এই আপনার মনে
পূরণ করিয়া লই যত পারি ভিক্ষালব্ধ ধনে।

আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত উঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি,
এই স্বরসাধনায় পৌঁছিল না বহুতর ডাক—
রয়ে গেছে ফাঁক।
কল্পনায় অনুমানে ধরিত্রীর মহা একতান
কত-না নিস্তব্ধক্ষণে পূর্ণ করিয়াছে মোর প্রাণ।
দুর্গম তুষারগিরি অসীম নিঃশব্দ নীলিমায়
অশ্রুত যে গান গায়

আমার অন্তরে বার বার
পাঠায়েছে নিমন্ত্রণ তার।
দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতায় রাত্রি তার করিতেছে সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব আলোকে।
সুদূরের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।
প্রকৃতির ঐকতানস্রোতে
নানা কবি ঢালে গান নানা দিক হতে—
তাদের সবার সাথে আছে মোর এইমাত্র যোগ,
সঙ্গ পাই সবাকার, লাভ করি আনন্দের ভোগ,
গীতভারতীর আমি পাই তো প্রসাদ
নিখিলের সংগীতের স্বাদ!

সব চেয়ে দুর্গম-যে মানুষ আপন অন্তরালে,
তার কোনো পরিমাপ নাই বাহিরের দেশে কালে।
সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।
পাই নে সর্বত্র তার প্রবেশের দ্বার,
বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।

চাষী খেতে চালাইছে হাল,
তাঁতি বসে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূরপ্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চ মঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।
জীবনে জীবন যোগ করা
না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পশরা।
তাই আমি মেনে নিই সে নিন্দার কথা
আমার সুরের অপূর্ণতা।
আমার কবিতা, জানি আমি,
গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বত্রগামী।
কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
সে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।
সাহিত্যের আনন্দের ভোজে
নিজে যা পারি না দিতে নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে।
সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ।

সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজ্‌দুরি।
এসো কবি অখ্যাতজনের
নির্বাক্‌ মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়ো উদ্ধার—
প্রাণহীন এ দেশেতে গানহীন যেথা চারি ধার
অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করি দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্‌বারি।
সাহিত্যের ঐকতান-সংগীতসভায়
একতারা যাহাদের তারাও সম্মান যেন পায়—
মূক যারা দুঃখে সুখে,
নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে,
ওগো গুণী,
কাছে থেকে দূরে যারা তাহাদের বাণী যেন শুনি।
তুমি থাকো তাহাদের জ্ঞাতি,
তোমার খ্যাতিতে তারা পায় যেন আপনারি খ্যাতি—
আমি বারংবার
তোমারে করিব নমস্কার॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২১ জানুয়ারি ১৯৪১
সকাল

১১

কালের প্রবল আবর্তে প্রতিহত
ফেনপুঞ্জের মতো,
আলোকে আঁধারে রঞ্জিত এই মায়া,
অদেহ ধরিল কায়া।
সত্তা আমার, জানি না সে কোথা হতে
হল উত্থিত নিত্যধাবিত স্রোতে।
সহসা অভাবনীয়
অদৃশ্য এক আরম্ভ-মাঝে কেন্দ্র রচিল স্বীয়।
বিশ্বসত্তা মাঝখানে দিল উঁকি,
এ কৌতুকের পশ্চাতে আছে জানি না কে কৌতুকী।
ক্ষণিকারে নিয়ে অসীমের এই খেলা,
নববিকাশের সাথে গেঁথে দেয় শেষ-বিনাশের হেলা,
আলোকে কালের মৃদঙ্গ উঠে বেজে,
গোপনে ক্ষণিকা দেখা দিতে আসে মুখ-ঢাকা বধূ সেজে
গলায় পরিয়া হার
বুদ্‌বুদ্‌ মণিকার।
সৃষ্টির মাঝে আসন করে সে লাভ,
অনন্ত তারে অন্তসীমায় জানায় আবির্ভাব॥

১২

করিয়াছি বাণীর সাধনা
দীর্ঘকাল ধরি,
আজ তারে ক্ষণে ক্ষণে উপহাস পরিহাস করি।
বহু ব্যবহার আর দীর্ঘ পরিচয়
তেজ তার করিতেছে ক্ষয়।
নিজেরে করিয়া অবহেলা
নিজেরে নিয়ে সে করে খেলা।
তবু জানি, অজানার পরিচয় আছিল নিহিত
বাক্যে তার বাক্যের অতীত।
সেই অজানার দূত আজি মোরে নিয়ে যায় দূরে

নিবেদন করিতে প্রণাম—
মন তাই বলিতেছে, আমি চলিলাম।

সেই সিন্ধু-মাঝে সূর্য দিনযাত্রা করি দেয় সারা,
সেথা হতে সন্ধ্যাতারা
রাত্রিরে দেখায়ে আনে পথ
যেথা তার রথ
চলেছে সন্ধান করিবারে
নূতন প্রভাত-আলো তমিস্রার পারে।

আজ সব কথা,
মনে হয়, শুধু মুখরতা।
তারা এসে থামিয়াছে
পুরাতন সে মন্ত্রের কাছে
ধ্বনিতেছে যাহা সেই নৈঃশব্দ্যচূড়ায়
সকল সংশয় তর্ক যে মৌনের গভীরে ফুরায়।
লোকখ্যাতি যাহার বাতাসে
ক্ষীণ হয়ে তুচ্ছ হয়ে আসে।
দিনশেষে কর্মশালা ভাষা-রচনার
নিরুদ্ধ করিয়া দিক দ্বার।
পড়ে থাক্ পিছে
বহু আবর্জনা, বহু মিছে।
বার বার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম—
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়,
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন অন্ধকারহীন,
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে।

এই বাহ্য আবরণ, জানি না তো, শেষে
নানা রূপে রূপান্তরে কালস্রোতে বেড়াবে কি ভেসে।
আপন স্বাতন্ত্র্য হতে নিঃসক্ত দেখিব তারে আমি
বাহিরে বহুর সাথে জড়িত অজানা তীর্থগামী।

আসন্ন বর্ষের শেষ। পুরাতন আমার আপন
শ্লথবৃন্ত ফলের মতন
ছিন্ন হয়ে আসিতেছে। অনুভব তারি
আপনারে দিতেছে বিস্তারি
আমার সকল-কিছু-মাঝে।
প্রচ্ছন্ন বিরাজে
নিগূঢ় অন্তরে যেই একা,
চেয়ে আছি পাই যদি দেখা।
পশ্চাতের কবি
মুছিয়া করিছে ক্ষীণ আপন হাতের আঁকা ছবি।
সুদূর সম্মুখে সিন্ধু, নিঃশব্দ রজনী,
তারি তীর হতে আমি আপনারি শুনি পদধ্বনি
অসীম পথের পান্থ, এবার এসেছি ধরা-মাঝে
মর্তজীবনের কাজে।
সে পথের 'পরে
ক্ষণে ক্ষণে অগোচরে

সকল পাওয়ার মধ্যে পেয়েছি অমূল্য উপাদেয়
এমন সম্পদ যাহা হবে মোর অক্ষয় পাথেয়।
মন বলে, আমি চলিলাম,
রেখে যাই আমার প্রণাম
তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা জীবনের আলো
ফেলেছেন পথে যাহা বারে বারে সংশয় ঘুচালো।

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১৯ জানুয়ারি ১৯৪১
সকাল

১৩

সৃষ্টিলীলাপ্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়াইয়া
দেখি ক্ষণে ক্ষণে
তমসের পরপার,
যেথা মহা-অব্যক্তের অসীম চৈতন্যে ছিনু লীন।
আজি এ প্রভাতকালে ঋষিবাক্য জাগে মোর মনে।
করো করো অপাবৃত, হে সূর্য, আলোক-আবরণ—
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি
আপনার আত্মার স্বরূপ।
যে আমি দিনের শেষে বায়ুতে মিশায় প্রাণবায়ু,
ভস্মে যার দেহ অন্ত হবে,
যাত্রাপথে সে আপন না ফেলুক ছায়া
সত্যের ধরিয়া ছদ্মবেশ।
এ মর্তের লীলাক্ষেত্রে সুখে দুঃখে অমৃতের স্বাদ
পেয়েছি তো ক্ষণে ক্ষণে,
বারে বারে অসীমেরে দেখেছি সীমার অন্তরালে।
বুঝিয়াছি, এ জন্মের শেষ অর্থ ছিল সেইখানে,
সেই সুন্দরের রূপে
সে সংগীতে অনির্বচনীয়।
খেলাঘরে আজ যবে খুলে যাবে দ্বার
ধরণীর দেবালয়ে রেখে যাব আমার প্রণাম,

দিয়ে যাব জীবনের সে নৈবেদ্যগুলি
মূল্য যার মৃত্যুর অতীত ॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১১ মাঘ ১৩৪৭
সকাল

১৪

পাহাড়ের নীলে আর দিগন্তের নীলে
শূন্যে আর ধরাতলে মন্ত্র বাঁধে ছন্দে আর মিলে।
বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি।
হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি,
মাঝখানে আমি আছি,
চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি।
আমার আনন্দে আজ একাকার ধ্বনি আর রঙ,
জানে তা কি এ কালিম্পঙ।

ভাণ্ডারে সঞ্চিত করে পর্বতশিখর
অন্তহীন যুগ যুগান্তর।
আমার একটি দিন বরমাল্য পরাইল তারে,
এ শুভ সংবাদ জানাবারে
অন্তরীক্ষে দূর হতে দূরে
অনাহত সুরে
প্রভাতে সোনার ঘণ্টা বাজে ঢঙ ঢঙ,
শুনিছে কি এ কালিম্পঙ॥

গৌরীপুরভবন। কালিম্পঙ
২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

১৫

মনে পড়ে, শৈলতটে তোমাদের নিভৃত কুটির,
হিমাদ্রি যেথায় তার সমুচ্চ শান্তির
আসনে নিস্তব্ধ নিত্য, তুঙ্গ তার শিখরের সীমা
লঙ্ঘন করিতে চায় দূরতম শূন্যের মহিমা।
অরণ্য যেতেছে নেমে উপত্যকা বেয়ে ;
নিশ্চল সবুজবন্যা, নিবিড় নৈঃশব্দ্যে রাখে ছেয়ে
ছায়াপুঞ্জ তার। শৈলশৃঙ্গ-অন্তরালে
প্রথম অরুণোদয়-ঘোষণার কালে
অন্তরে আনিত স্পন্দ বিশ্বজীবনের
সদ্যস্ফূর্ত চঞ্চলতা। নির্জন বনের
গূঢ় আনন্দের যত ভাষাহীন বিচিত্র সংকেতে
লভিতাম হৃদয়েতে
যে বিস্ময় ধরণীর, প্রাণের আদিম সূচনায়।
সহসা নাম-না-জানা পাখিদের চকিত পাখায়
চিন্তা মোর যেত ভেসে
শুভ্রহিমরেখাঙ্কিত মহানিরুদ্দেশে।
বেলা যেত, লোকালয়
তুলিত ত্বরিত করি সুপ্তোত্থিত শিথিল সময়।
গিরিগাত্রে পথ গেছে বেঁকে,
বোঝা বহি চলে লোক, গাড়ি ছুটে চলে থেকে থেকে।

পার্বতী জনতা
বিদেশী প্রাণযাত্রার খণ্ড খণ্ড কথা
মনে যায় রেখে,
রেখা-রেখা অসংলগ্ন ছবি যায় এঁকে।
শুনি মাঝে মাঝে
অদূরে ঘণ্টার ধ্বনি বাজে,
কর্মের দৌত্য সে করে
প্রহরে প্রহরে।
প্রথম আলোর স্পর্শ লাগে,
আতিথ্যের সখ্য জাগে
ঘরে ঘরে। স্তরে স্তরে দ্বারের সোপানে
নানারঙা ফুলগুলি অতিথির প্রাণে
গৃহিণীর যত্ন বহি প্রকৃতির লিপি নিয়ে আসে
আকাশে বাতাসে।
কলহাস্যে মানুষের স্নেহের বারতা
যুগযুগান্তের মৌনে হিমাদ্রির আনে সার্থকতা॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
বিকাল

১৬

দামামা ঐ বাজে,
দিন-বদলের পালা এল
ঝোড়ো যুগের মাঝে।
শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়—
নইলে কেন এত অপব্যয়,
আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত
ভবিষ্যতের দূত।
কৃপণতার পাথর-ঠেলা বিষম বন্যাধারা
লোপ করে দেয় নিঃস্ব মাটির নিষ্ফলা চেহারা।
জমে-ওঠা মৃত বালির স্তর
ভাসিয়ে নিয়ে ভর্তি করে লুপ্তির গহ্বর ;
পলিমাটির ঘটায় অবকাশ,
মরুকে সে মেরে মেরেই গজিয়ে তোলে ঘাস।
দুব্‌লা খেতের পুরানো সব পুনরুক্তি যত
অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।
অন্তরেতে মৃত
বাইরে তবু মরে না যে অন্ন ঘরে করেছে সঞ্চিত,
ওদের ঘিরে ছুটে আসে অপব্যয়ের ঝড়,
ভাঁড়ারে ঝাঁপ ভেঙে ফেলে, চালে ওড়ায় খড়।

অপঘাতের ধাক্কা এসে পড়ে ওদের ঘাড়ে,
জাগায় হাড়ে হাড়ে।
হঠাৎ অপমৃত্যুর সংকেতে
নূতন ফসল চাষের তরে আনবে নূতন খেতে।
শেষ পরীক্ষা ঘটাবে দুর্দৈবে—
জীর্ণ যুগের সঞ্চয়েতে কী যাবে কী রইবে।
পালিশ-করা জীর্ণতাকে চিনতে হবে আজি,
দামামা তাই ঐ উঠেছে বাজি॥

৩১ মে ১৯৪০

১৭

সেই পুরাতন কালে ইতিহাস যবে
সংবাদে ছিল না মুখরিত
নিস্তব্ধ খ্যাতির যুগে—
আজিকার এইমত প্রাণযাত্রাকল্লোলিত প্রাতে
যাঁরা যাত্রা করেছেন
মরণশঙ্কিল পথে
আত্মার অমৃত-অন্ন করিবারে দান
দূরবাসী অনাত্মীয় জনে,
দলে দলে যাঁরা
উত্তীর্ণ হন নি লক্ষ্য, তৃষানিদারুণ
মরুবালুতলে অস্থি গিয়েছেন রেখে,
সমুদ্র যাঁদের চিহ্ন দিয়েছে মুছিয়া,
অনারব্ধ কর্মপথে
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা—
মিশিয়া আছেন সেই দেহাতীত মহাপ্রাণ-মাঝে
শক্তি জোগাইছে যাহা অগোচরে চিরমানবেরে,
তাঁহাদের করুণার স্পর্শ লভিতেছি
আজি এই প্রভাত-আলোকে,
তাঁহাদের করি নমস্কার ॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
১২ ডিসেম্বর ১৯৪০
সকাল

১৮

নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায় বারংবার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো,
আপনারে ভুলো না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ,
সব তুচ্ছতার ঊর্ধ্বে দীপ যারা জ্বালে অনির্বাণ,
তাহাদের মাঝে যেন হয়
তোমাদেরি নিত্য পরিচয়।
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে রবে নিরবধি।
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়॥

১৯

বয়স আমার বুঝি হয়তো তখন হবে বারো,
অথবা কী জানি হবে দুয়েক বছর বেশি আরো।
পুরাতন নীলকুঠি-দোতালার 'পর
ছিল মোর ঘর।
সামনে উধাও ছাত—
দিন আর রাত
আলো আর অন্ধকারে
সাথিহীন বালকের ভাবনারে
এলোমেলো জাগাইয়া যেত,
অর্থশূন্য প্রাণ তারা পেত,
যেমন সমুখে নীচে
আলো পেয়ে বাড়িয়া উঠিছে
বেতগাছ ঝোপঝাড়ে
পুকুরের পাড়ে
সবুজের আল্পনায় রঙ দিয়ে লেপে।
সারি সারি ঝাউগাছ ঝরঝর কেঁপে
নীলচাষ-আমলের প্রাচীন মর্মর
তখনো চলিছে বহি বৎসর বৎসর।
বৃদ্ধ সে গাছের মতো তেমনি আদিম পুরাতন
বয়স-অতীত সেই বালকের মন

নিখিল প্রাণের পেত নাড়া,
আকাশের অনিমেষ দৃষ্টির ডাকে দিত সাড়া,
তাকায়ে রহিত দূরে।
রাখালের বাঁশির করুণ সুরে
অস্তিত্বের যে বেদনা প্রচ্ছন্ন রয়েছে,
নাড়ীতে উঠিত নেচে।
জাগ্রত ছিল না বুদ্ধি, বুদ্ধির বাহিরে যাহা তাই
মনের দেউড়ি-পারে দ্বারী-কাছে বাধা পায় নাই।
স্বপ্নজনতার বিশ্বে ছিল দ্রষ্টা কিংবা স্রষ্টা -রূপে,
পণ্যহীন দিনগুলি ভাসাইয়া দিত চুপে চুপে
পাতার ভেলায়
নিরর্থ খেলায়।
টাট্টু ঘোড়া চড়ি
রথতলা-মাঠে গিয়ে দুর্দাম ছুটাত তড়বড়ি,
রক্তে তার মাতিয়ে তুলিত গতি,
নিজেরে ভাবিত সেনাপতি
পড়ার কেতাবে যারে দেখে
ছবি মনে নিয়েছিল এঁকে।
যুদ্ধহীন রণক্ষেত্রে ইতিহাসহীন সেই মাঠে
এমনি সকাল তার কাটে।
জবা নিয়ে গাঁদা নিয়ে নিঙাড়িয়া রস
মিশ্রিত ফুলের রঙে কী লিখিত, সে লেখার যশ

আপন মর্মের মাঝে হয়েছে রঙিন—
বাহিরের করতালিহীন।
সন্ধ্যাবেলা বিশ্বনাথ শিকারীকে ডেকে
তার কাছ থেকে
বাঘ-শিকারের গল্প নিস্তব্ধ সে ছাতের উপর
মনে হত সংসারের সব চেয়ে আশ্চর্য খবর।
দম্ ক'রে মনে মনে ছুটিত বন্দুক,
কাঁপিয়া উঠিত বুক।
চারি দিকে শাখায়িত সুনিবিড় প্রয়োজন যত
তারি মাঝে এ বালক অর্কিড-তরুকার মতো
ডোরাকাটা খেয়ালের অদ্ভুত বিকাশে
দোলে শুধু খেলার বাতাসে।
যেন সে রচয়িতার হাতে
পুঁথির প্রথম শূন্য পাতে
অলংকরণ-আঁকা, মাঝে মাঝে অস্পষ্ট কী লেখা,
বাকি সব আঁকাবাঁকা রেখা।
আজ যবে চলিতেছে সাংঘাতিক হিসাব-নিকাশ,
দিগ্‌দিগন্তে ক্ষমাহীন অদৃষ্টের দশনবিকাশ,
বিধাতার ছেলেমানুষির
খেলাঘর যত ছিল ভেঙে সব হল চৌচির।
আজ মনে পড়ে সেই দিন আর রাত,
প্রশস্ত সে ছাত,

সেই আলো সেই অন্ধকারে
কর্মসমুদ্রের মাঝে নৈষ্কর্ম্যদ্বীপের পারে
বালকের মনখানা মধ্যাহ্নে ঘুঘুর ডাক যেন।
এ সংসারে কী হতেছে কেন,
ভাগ্যের চক্রান্তে কোথা কী যে,
প্রশ্নহীন বিশ্বে তার জিজ্ঞাসা করে নি কভু নিজে।
এ নিখিলে যে জগৎ ছেলেমানুষির
বয়স্কের দৃষ্টিকোণে সেটা ছিল কৌতুকহাসির,
বালকের জানা ছিল না তা।
সেইখানে অবাধ আসন তার পাতা।
সেথা তার দেবলোক, স্বকল্পিত স্বর্গের কিনারা,
বুদ্ধির ভর্ৎসনা নাই, নাই সেথা প্রশ্নের পাহারা,
যুক্তির সংকেত নাই পথে,
ইচ্ছা সঞ্চরণ করে বল্গামুক্ত রথে॥

২০

মনে ভাবিতেছি, যেন অসংখ্য ভাষার শব্দরাজি
ছাড়া পেল আজি,
দীর্ঘকাল ব্যাকরণদুর্গে বন্দী রহি
অকস্মাৎ হয়েছে বিদ্রোহী
অবিশ্রাম সারি সারি কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে-
উঠেছে অধীর হয়ে খেপে।
লঙ্ঘিয়াছে বাক্যের শাসন,
নিয়েছে অবুদ্ধিলোকে অবদ্ধ ভাষণ,
ছিন্ন করি অর্থের শৃঙ্খলপাশ
সাধুসাহিত্যের প্রতি ব্যঙ্গহাস্যে হানে পরিহাস।
সব ছেড়ে অধিকার করে শুধু শ্রুতি—
বিচিত্র তাদের ভঙ্গী, বিচিত্র আকৃতি।
বলে তারা, আমরা যে এই ধরণীর
নিশ্বসিত পবনের আদিম ধ্বনির
জন্মেছি সন্তান,
যখনি মানবকণ্ঠে মনোহীন প্রাণ
নাড়ীর দোলায় সদ্য জেগেছে নাচিয়া
উঠেছি বাঁচিয়া।
শিশুকণ্ঠে আদিকাব্যে এনেছি উচ্ছলি
অস্তিত্বের প্রথম কাকলি।

গিরিশিরে যে পাগল-ঝোরা
শ্রাবণের দূত, তারি আত্মীয় আমরা
আসিয়াছি লোকালয়ে
সৃষ্টির ধ্বনির মন্ত্র লয়ে।
মর্মরমুখর বেগে
যে ধ্বনির কলোৎসব অরণ্যের পল্লবে পল্লবে,
যে ধ্বনি দিগন্তে করে ঝড়ের ছন্দের পরিমাপ,
নিশান্তে জাগায় যাহা প্রভাতের প্রকাণ্ড প্রলাপ,
সে ধ্বনির ক্ষেত্র হতে হরিয়া করেছে পদানত
বন্য ঘোটকের মতো
মানুষ শব্দেরে তার জটিল নিয়মসূত্রজালে
বার্তাবহনের লাগি অনাগত দূর দেশে কালে।
বল্গাবদ্ধ শব্দ-অশ্বে চড়ি
মানুষ করেছে দ্রুত কালের মন্থর যত ঘড়ি।
জড়ের অচল বাধা তর্কবেগে করিয়া হরণ
অদৃশ্য রহস্যলোকে গহনে করেছে সঞ্চরণ,
ব্যূহে বাঁধি শব্দ-অক্ষৌহিণী
প্রতি ক্ষণে মূঢ়তার আক্রমণ লইতেছে জিনি।
কখনো চোরের মতো পশে ওরা স্বপ্নরাজ্যতলে,
ঘুমের ভাঁটার জলে
নাহি পায় বাধা—
যাহা-তাহা নিয়ে আসে, ছন্দের বাঁধনে পড়ে বাঁধা ;

তাই দিয়ে বুদ্ধি অন্যমনা
করে সেই শিল্পের রচনা
সূত্র যার অসংলগ্ন স্খলিত শিথিল
বিধির সৃষ্টির সাথে না রাখে একান্ত তার মিল ;
যেমন মাতিয়া উঠে দশ-বিশ কুকুরের ছানা,
এ ওর ঘাড়েতে চড়ে কোনো উদ্দেশ্যের নাই মানা,
কে কাহারে লাগায় কামড়,
জাগায় ভীষণ শব্দে গর্জনের ঝড়,
সে কামড়ে সে গর্জনে কোনো অর্থ নাই হিংস্রতার,
উদ্দাম হইয়া উঠে শুধু ধ্বনি শুধু ভঙ্গী তার।
মনে মনে দেখিতেছি, সারা বেলা ধরি
দলে দলে শব্দ ছোটে অর্থ ছিন্ন করি—
আকাশে আকাশে যেন বাজে,
আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে ॥

গৌরীপুরভবন
কালিম্পঙ
২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৪০

২১

রক্তমাখা দন্তপংক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষ-মানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,
লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।
অসন্তুষ্ট বিধাতার
ওরা দূত বুঝি,
শত শত বর্ষের পাপের পুঁজি

ছড়াছড়ি করে দেয় এক সীমা হতে সীমান্তরে,
রাষ্ট্রমদমত্তদের মদ্যভাণ্ড চূর্ণ করে
আবর্জনাকুণ্ডতলে।
মানব আপন সত্তা ব্যর্থ করিয়াছে দলে দলে,
বিধাতার সংকল্পের নিত্যই করেছে বিপর্যয়
ইতিহাসময়।
সেই পাপে
আত্মহত্যা-অভিশাপে
আপনার সাধিছে বিলয়।
হয়েছে নির্দয়,
আপন ভীষণ শত্রু আপনার 'পরে
ধূলিসাৎ করে
ভূরিভোজী বিলাসীর
ভাণ্ডারপ্রাচীর।

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,

বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান ॥

গৌরীপুরভবন
কালিম্পঙ
২২ মে ১৯৪০

২২

সিংহাসনতলচ্ছায়ে দূরে দূরান্তরে
যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে
রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা,
পায়ের তলায় রাখে সর্বনাশ চাপা।
হতভাগ্য যে রাজ্যের সুবিস্তীর্ণ দৈন্যজীর্ণ প্রাণ
রাজমুকুটেরে নিত্য করিছে কুৎসিত অপমান,
অসহ্য তাহার দুঃখ তাপ
রাজারে না যদি লাগে, লাগে তারে বিধাতার শাপ
মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত,
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির
ঝড়ের সংকট-দিনে রহিবে না স্থির,

সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন—
আসিবে বিধির কাছে হিসাব-চুকিয়ে-দেওয়া দিন।
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে ॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৪ জানুয়ারি ১৯৪১
বিকাল

২৩

জীবনবহনভাগ্য নিত্য আশীর্বাদে
ললাট করুক স্পর্শ
অনাদি জ্যোতির দান-রূপে—
নব নব জাগরণে প্রভাতে প্রভাতে
মর্ত্ত এ আয়ুর সীমানায়।
ম্লানিমার ঘন আবরণ
দিনে দিনে পড়ুক খসিয়া
অমর্ত্তলোকের দ্বারে
নিদ্রায়-জড়িত রাত্রি-সম।
হে সবিতা, তোমার কল্যাণতম রূপ
করো অপাবৃত,
সেই দিব্য আবির্ভাবে
হেরি আমি আপন আত্মারে
মৃত্যুর অতীত॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৭ পৌষ ১৩৪৭

২৪

পোড়ো বাড়ি, শূন্য দালান—
বোবা স্মৃতির চাপা কাঁদন হুহু করে,
মরা-দিনের-কবর-দেওয়া ভিতের অন্ধকার
গুমরে ওঠে প্রেতের কণ্ঠে সারা ত্বপুরবেলা।
মাঠে মাঠে শুকনো পাতার ঘূর্ণিপাকে
হাওয়ার হাঁপানি।
হঠাৎ হানে বৈশাখী তার বর্বরতা
ফাগুন-দিনের যাবার পথে।

সৃষ্টিপীড়া ধাক্কা লাগায়
শিল্পকারের তূলির পিছনে।
রেখায় রেখায় ফুটে ওঠে
রূপের বেদনা
সাথিহারার তপ্ত রাঙা রঙে।
কখনো বা ঢিল লেগে যায় তূলির টানে;
পাশের গলির চিক-ঢাকা ঐ ঝাপসা আকাশতলে
হঠাৎ যখন রণিয়ে ওঠে
সংকেতঝংকার,
আঙুলের ডগার 'পরে নাচিয়ে তোলে মাতালটাকে
গোধূলির সিঁদুর ছায়ায় ঝ'রে পড়ে

পাগলা আবেগের
হাউই-ফাটা আগুনঝুরি।

বাধা পায়, বাধা কাটায় চিত্রকরের তূলি।
সেই বাধা তার কখনো বা হিংস্র অশ্লীলতায়,
কখনো বা মদির অসংযমে।
মনের মধ্যে ঘোলা স্রোতের জোয়ার ফুলে ওঠে,
ভেসে চলে ফেনিয়ে-ওঠা অসংলগ্নতা।
রূপের বোঝাই ডিঙি নিয়ে চলল রূপকার
রাতের উজান স্রোত পেরিয়ে
হঠাৎ-মেলা ঘাটে।
ডাইনে বাঁয়ে সুর-বেসুরের দাঁড়ের ঝাপট চলে,
তাল দিয়ে যায় ভাসান-খেলা শিল্পসাধনার॥

শান্তিনিকেতন
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৯

২৫

জটিল সংসার,
মোচন করিতে গ্রন্থি জড়াইয়া পড়ি বারংবার।
গম্য নহে সোজা,
দুর্গম পথের যাত্রা স্কন্ধে বহি দুশ্চিন্তার বোঝা।
পথে পথে যথাতথা
শত শত কৃত্রিম বক্রতা।
অনুক্ষণ
হতাশ্বাস হয়ে শেষে হার মানে মন।
জীবনের ভাঙা ছন্দে ভ্রষ্ট হয় মিল,
বাঁচিবার উৎসাহ ধূলিতলে লুটায় শিথিল।

ওগো আশাহারা,
শুষ্কতার 'পরে আনো নিখিলের রসবন্যাধারা।
বিরাট আকাশে,
বনে বনে, ধরণীর ঘাসে ঘাসে,
সুগভীর অবকাশ পূর্ণ হয়ে আছে
গাছে গাছে,
অন্তহীন শান্তি-উৎস-স্রোতে।
অন্তঃশীল যে রহস্য আঁধারে আলোতে
তারে সদ্য করুক আহ্বান

আদিম প্রাণের যজ্ঞে মর্মের সহজ সামগান।
আত্মার মহিমা যাহা তুচ্ছতায় দিয়েছে জর্জরি
ম্লান অবসাদে, তারে দাও দূর করি,
লুপ্ত হয়ে যাক শূন্যতলে
দ্যুলোকের ভূলোকের সম্মিলিত মন্ত্রণার বলে

২৬

ফুলদানি হতে একে একে
আয়ুক্ষীণ গোলাপের পাপড়ি পড়িল ঝরে ঝরে।
ফুলের জগতে
মৃত্যুর বিকৃতি নাহি দেখি।
শেষ ব্যঙ্গ নাহি হানে জীবনের পানে অসুন্দর।
যে মাটির কাছে ঋণী
আপনার ঘৃণা দিয়ে অশুচি করে না তারে ফুল,
রূপে গন্ধে ফিরে দেয় ম্লান অবশেষ।
বিদায়ের সকরুণ স্পর্শ আছে তাহে,
নাইকো ভর্ৎসনা।
জন্মদিনে মৃত্যুদিনে দোঁহে যবে করে মুখোমুখি
দেখি যেন সে মিলনে
পূর্বাচলে অস্তাচলে
অবসন্ন দিবসের দৃষ্টিবিনিময়—
সমুজ্জ্বল গৌরবের প্রণত সুন্দর অবসান॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
বিকাল

২৭

বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়
সন্ধ্যা— তারি নীরব নির্দেশে
নিখিল গতির বেগ ধায় তারি পানে।
চৌদিকে ধূসরবর্ণ আবরণ নামে।
মন বলে, ঘরে যাব—
কোথা ঘর নাহি জানে।
দ্বার খোলে সন্ধ্যা নিঃসঙ্গিনী,
সম্মুখে নীরন্ধ্র অন্ধকার।
সকল আলোর অন্তরালে
বিস্মৃতির দূতী
খুলে নেয় এ মর্তের ঋণ-করা সাজসজ্জা যত—
প্রক্ষিপ্ত যা-কিছু তার নিত্যতার মাঝে
ছিন্ন জীর্ণ মলিন অভ্যাস।
আঁধারে অবগাহন-স্নানে
নির্মল করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে।
জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্যপথে দেয় মুক্ত করি
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে।
নব জন্মদিন তারে বলি
আঁধারের মন্ত্র পড়ি সন্ধ্যা যারে জাগায় আলোকে

২৮

নদীর পালিত এই জীবন আমার।
নানা গিরিশিখরের দান
নাড়ীতে নাড়ীতে তার বহে,
নানা পলিমাটি দিয়ে ক্ষেত্র তার হয়েছে রচিত,
প্রাণের রহস্যরস নানা দিক হতে
শস্যে শস্যে লভিল সঞ্চার।
পূর্বপশ্চিমের নানা গীতস্রোতজালে
ঘেরা তার স্বপ্ন জাগরণ।
যে নদী বিশ্বের দূতী
দূরকে নিকটে আনে,
অজানার অভ্যর্থনা নিয়ে আসে ঘরের দুয়ারে,
সে আমার রচেছিল জন্মদিন—
চিরদিন তার স্রোতে
বাঁধন-বাহিরে মোর চলমান বাসা
ভেসে চলে তীর হতে তীরে।
আমি ব্রাত্য, আমি পথচারী,
অবারিত আতিথ্যের অন্নে পূর্ণ হয়ে ওঠে
বারে বারে নির্বিচারে মোর জন্মদিবসের থালি॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১
দুপুর

২৯

তোমাদের জানি, তবু তোমরা যে দূরের মানুষ।
তোমাদের আবেষ্টন, চলা-ফেরা, চারি দিকে ঢেউ ওঠা-পড়া
সবই চেনা জগতের, তবু তার আমন্ত্রণে দ্বিধা—
সবা হতে আমি দূরে, তোমাদের নাড়ীর যে ভাষা
সে আমার আপন প্রাণের, বিষণ্ণ বিস্ময় লাগে
যবে দেখি স্পর্শ তার সসংকোচ পরিচয় নিয়ে
আনে যেন প্রবাসীর পাণ্ডুবর্ণ শীর্ণ আত্মীয়তা।
আমি কিছু দিতে চাই, তা না হলে জীবনে জীবনে
মিল হবে কী করিয়া— আসি না নিশ্চিত পদক্ষেপে—
ভয় হয়, রিক্ত পাত্র বুঝি, বুঝি তার রসস্বাদ
হারায়েছে পূর্বপরিচয়, বুঝি আদানে প্রদানে
রবে না সম্মান। তাই আশঙ্কার এ দূরত্ব হতে
এ নিষ্ঠুর নিঃসঙ্গতা-মাঝে তোমাদের ডেকে বলি,
যে জীবনলক্ষ্মী মোরে সাজায়েছে নব নব সাজে
তার সাথে বিচ্ছেদের দিনে নিভায়ে উৎসবদীপ
দারিদ্র্যের লাঞ্ছনায় ঘটাবে না কভু অসম্মান,
অলংকার খুলে নেবে, একে একে বর্ণসজ্জাহীন উত্তরীয়ে
ঢেকে দিবে, ললাটে আঁকিবে শুভ্র তিলকের রেখা ;
তোমরাও যোগ দিয়ো জীবনের পূর্ণ ঘট নিয়ে
সে অন্তিম অনুষ্ঠানে, হয়তো শুনিবে দূর হতে
দিগন্তের পরপারে শুভশঙ্খধ্বনি ॥

উদয়ন। শান্তিনিকেতন
৯ মার্চ ১৯৪১। সকাল